Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.58-64
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতার মূল্যবোধ: গৌতম বুদ্ধের শিক্ষায়

সৌরভ মজুমদার

পিএইচ. ডি. রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এবং

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, কাটোয়া কলেজ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Buddha's moral teachings and application of his values can be seen in the practical life of people. According to Buddha, the world and life are miserable. As human life is driven by desire, there is more suffering than happiness. Determining the difference between good and bad, right and wrong was not the only goal in Buddhadeva's morality. The aim here was deeper- how to give the suffering man a unique and ultimate release or nirvana from suffering. For this purpose, he tried to make people aware of suffering, its origin, its removal and the way to remove it. His view on these four points is the fundamental theory of morality.

Key words: Four Noble Truths, Suffering, Nirvana, Morality, Ahimsa.

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধদর্শন একটি নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবের উপদেশ বা বাণী হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের উৎস। জড়ামরণ জনিত মানুষের দুঃখ কষ্টে তিনি এতই ব্যথিত হন যে দুঃখের কারণ নির্ণয়ের জন্য এবং দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি প্রয়াস করেন। মানুষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন। আধ্যাত্মিক সাধনা লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধদেব চারটি মহান সত্য লাভ করেন। বৌদ্ধ দর্শনে এই চারটি মহান সত্য আর্যসত্য নামে পরিচিত। এই আর্যসত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্ব গুলি ভালোভাবে উপলব্ধি করলে জীবনে শান্তি আসে। তিনি কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কর্মবাদ অনুসারে মানুষ মাত্রই তার কৃতকর্মের জন্য ফল ভোগ করে। মানুষের জীবনে এই নিয়ম অলঙ্ঘ্য। বুদ্ধমতে কামনাশূন্যভাবে কর্মের মাধ্যমেই নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। নির্বাণ জন্মজন্মান্তরের ঘূর্ণমান চক্রই হল দুঃখকষ্ট জর্জরিত সংসারচক্র এবং কামনার বিলোপ ঘটিয়ে কর্ম সাধনের মাধ্যমে দুঃখ মুক্তি হল নির্বাণ।

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীতিদর্শন তাদের অধিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে অধিবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। কারণ সেই সময়ে বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ এবং তার থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করতেই সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধদেব যে তত্ত্ব বা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তা নয়। তিনি মনে করেছিলেন যে জীবনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই

বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানেন যে তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, দুঃখের অবসান হয় না, অথবা শান্তি বা নির্বাণ লাভ হয় না। আমরা বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা পায়।

নৈতিক শিক্ষায় বুদ্ধদেব: বৌদ্ধ নীতিদর্শন কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি যে মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু বুদ্ধদেব কে বিচলিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন যে জীবন ও জগৎ সতত পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। ক্ষণিকবাদ বা অনিত্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের দুটি মুখ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বুদ্ধদেবের নীতিদর্শন গড়ে উঠেছে। জীবন অনিত্য বলেই দুঃখময় এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্যই বুদ্ধদেব তাঁর নীতিদর্শন রচনা করেন।

ধর্মই বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা যে ব্যক্তি ধর্ম পালন করেন তিনি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের অধিকারী হন। জগৎ ও জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, সুখও যেহেতু পরিণামে দুঃখ উৎপাদন করে তাই আসক্তি পরিত্যাগ করে নিরাসক্তির সাধনা করা কর্তব্য। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান মানুষের সকল দুঃখের কারণ। তাই অজ্ঞানের বিনাশের জন্য নিরাসক্তির সাধনা বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার মূলকথা বলে স্বীকার করা হয়েছে। নিরাসক্তির এই সাধনার লক্ষ্য হল বোধিসত্ত্ব লাভ। বৌদ্ধদর্শনে তাঁকেই বোধিসত্ত্ব বলা হয়েছে যিনি অহংবোধকে বিসর্জন দিতে সমর্থ হয়েছেন এবং যিনি ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতিকে অতিক্রম করে দয়া মমতা, মৈত্রী প্রভৃতি ধর্মলাভ করেন। বৌদ্ধনীতিদর্শন মানুষকে ধর্মীয় উৎকর্ষতার পথে নিয়ে যায়। সুখ ও দুঃখ, শৈত্য ও উষ্ণতা, আনন্দ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতির ঊর্ধ্বে গমন করে মানুষের এই উৎকর্ষতা লাভ করে। বোধিসত্ত্বের ধারণা তাই গীতায় উল্লেখিত স্থিত প্রজ্ঞের ধারণার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই নৈতিক আদর্শটি পরাতাত্ত্বিক আদর্শে মিশে গিয়েছে।

এইসব বিষয়গুলি চারটি আর্যসত্যের মধ্যে রয়েছে। বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব ও উদ্দেশ্যর মূলকথা চারটি আর্যসত্যে নিহিত আছে। আর্যসত্য গুলি হল:

প্রথম আর্যসত্য: দুঃখ আছে। বুদ্ধদেবের মতে জগতে সমস্ত সত্তাই দুঃখময়। মানুষের জীবনে জন্ম যেমন দুঃখ, তেমনই রোগ, জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু সবই দুঃখ। বৌদ্ধমতে যখন জগতকে দুঃখময় বলে উল্লেখ করেন তখন দুঃখ বলতে তাঁরা কিন্তু সাধারণ জাগতিক কষ্ট বোঝান না। তাঁদের মতে দুঃখ হল জগতে যে কোন ধরনের অস্তিত্ব, তা মানুষরূপে হোক, বা মনুষ্যেতর প্রাণী রূপে হোক বা অন্য কিছুই রূপে হোক। কারণ জগতের যে ধরণের সত্তাই থাকুক না কেন, ধন, জন, সম্মান এমন কি অলৌকিক ক্ষমতা পর্যন্ত সবই একসময় না একসময় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমন্বয়ে যা কিছু গঠিত তারই দুঃখে পরিসমাপ্তি এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই দুঃখের যোগ আছে কারণ প্রতি মুহূর্তে সেগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শেষে সবগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এইভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে দুঃখের সঙ্গে যোগ থাকায় জগতের সবই দুঃখময়।

যদিও ব্যাবহারিক স্তরে বুদ্ধদেব সুখ বা পরিতৃপ্তিবোধকে অস্বীকার করেন না। তাই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি আবার সুখ-ও আছে। জাগতিক অস্তিত্ব যদি নিছক দুঃখময়, কষ্টদায়ক হত, তাহলে ঐ অস্তিত্বব্যাপারে কারোর মধ্যেই কোন আকর্ষণ থাকত না। আবার বিপরীতেক্রমে জগতে দুঃখকষ্ট আছে বলেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে মানুষ। বস্তুর ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাবশত বস্তুর আসল স্বরূপ অবগত না হওয়ায় তারা দুঃখের

বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখ-তাপে ক্লিষ্ট হয়ে মানুষ এ-যাবৎ যে পরিমাণ অশ্রুবর্ষণ করেছে তা সব সমুদ্রের জলের পরিমাণ এর থেকেও বেশি। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে মানুষের জীবনকে দুঃখের নামান্তর বলে মনে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আর্যসত্য: দুঃখসমুদয় বা দুঃখের কারণ আছে। যদিও সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকরাই একমত যে জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপত্তি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বৌদ্ধ দার্শনিকরা তাঁদের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের সাহায্যে দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করেন। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'কারণের সহযোগে উৎপত্তি'। এই মতে জগতের প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন কারণ সহযোগে উৎপন্ন হয়। কারণ ছাড়া কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। দুঃখ যেহেতু কার্য, সেহেতু দুঃখও কারণ থেকে উৎপন্ন। বৌদ্ধরা জগতের বিভিন্ন প্রকার দুঃখকে জরামরণ বলেন। এই জরামরণের কারণ জগতে জন্ম আছে। জন্ম আছে বলেই দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যু আছে। জন্মের কারণ কি? ভব বা জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা বা ব্যাকুলতা আছে বলেই জীবের জন্ম হয়। এই ব্যাকুলতা বা ইচ্ছার কারণ হল জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি হয় তার কারণ বিষয় ভোগের বাসনা বা তৃষ্ণা থেকে। বেদনা বা অনুভূতি ফলেই তৃষ্ণা জন্মায়। এই বেদনার কারণ হল স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ না হলে বেদনা উৎপন্ন হয় না। এই ইন্দ্রিয় বৌদ্ধ মতে ষড়ায়তন -চক্ষু, কর্ণাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন। এই ষড়ায়তন কার্যকর হয় না, যদি না নামরূপ বা দেহ-মনের সংগঠন থাকে। এই নামরূপের উৎপত্তি হয় চেতনার ফলে। এই বিজ্ঞান বা চেতনা আছে বলেই জীবদেহ মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হতে পারে। এরূপ চেতনার কারণ হল পূর্ব পূর্ব জীবনের সংস্কার। পূর্ব জীবনের যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। এই সংস্কার হল অতীত জীবনের ছাপ। মাতৃগর্ভে ভ্রুনের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনর্জন্ম হতে থাকে তার কারণ হলো অবিদ্যা। অবিদ্যাবশত মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করে, যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখজনক তাকেও সুখ বলে মনে করে। সুতরাং অবিদ্যা হলো জগতের মূল কারণ।

দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত কার্য-কারণশৃঙ্খল কে বৌদ্ধদর্শনে 'দ্বাদশ-নিদান' বা 'ভবচক্র' বলা হয়। "এই হল কার্য-কারণ মালার ১২টি অঙ্গ। এই তালিকায় সংক্ষেপে বুদ্ধের দর্শনের চুম্বকে বর্ণনা পাওয়া যায়। তার জন্য একে বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মের চাবিকাঠি বলা হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধই বলেছেন- যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে জানেন তিনি ধর্মকে জানেন"।[১]

তৃতীয় আর্যসত্য: দুঃখ নিরোধ সম্ভব। বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা দূরীভূত হলে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বৌদ্ধ দর্শনে 'নির্বাণ' বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তৃষ্ণাজনিত কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সত্যের অবিরত অনুশীলন করে যান, তাহলে তিনি জাগতিক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হবেন না। ফলে তিনি বন্ধনের কারণ ছিন্ন করে মুক্ত হন। তিনি মুক্ত, এবং তাঁকে বলা হয় অর্হৎ বা পূজনীয় ব্যক্তি। এই মুক্ত পুরুষের অবস্থাই নির্বাণ বলে বর্ণিত। সুতরাং নির্বাণ হল দুঃখ সমুদয়ের নিবৃত্তি এবং সমস্ত জাগতিক বাসনার প্রতি নিরাসক্তি।

'নির্বাণ' শব্দের একটি অর্থ 'নিভিয়ে যাওয়া' বা 'নির্বাপিত হওয়া'। এই অর্থ গ্রহণ করে অনেকে নির্বাণ বলতে অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধের নিজের জীবনই এই মতের বিরোধিতা করেন।

এই মত সত্য হলে বুদ্ধদেব যে জীবিত অবস্থায় বোধি লাভ করেন -একথা মিথ্যা হয়ে পড়ে। "নির্বাণ শব্দের চার প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। যথা - (ক) বাণ শব্দের অর্থ -পথ (অর্থাৎ পুনর্জন্মের হেতু), নিঃ শব্দের অর্থ - পরিত্যাগ। পুনর্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্বাণ। (খ) বাণ অর্থে দুর্গন্ধ বা কুৎসিত বাসনা -নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ - শুভাশুভ বাসনার নিবৃত্তি। (গ) বাণ - গভীর বন। নিঃ- নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থে - রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দুর্ভেদ্য বা গভীর বন হতে নির্গত হওয়া। (ঘ) বাণ - গ্রন্থি, নিঃ- ছেদ বা নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ - জন্ম ও মৃত্যুর গ্রন্থি বা জালের ছেদন"।[২]

তাই বোধি প্রাপ্তির পর বুদ্ধদেবও ঘোষণা করেছিলেন- 'আমি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপু জয় করেছি, সর্বদর্শী হয়েছি, সকল বিষয়ে অনাসক্ত, সর্বত্যাগী হয়ে আমি তৃষ্ণা ক্ষয়ে বিমুক্ত হয়েছি।'[৩] বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেন নির্বাণ কে আনন্দময় অবস্থা বলেছেন। তিনি রূপক এর সাহায্যে নির্বাণের আনন্দময় অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন- 'নির্বাণ পদ্মের মত অবিকৃত, জলের মত শীতল ও তাপ হরণকারী, ঔষধের মত দুঃখের নিবর্তক, সমুদ্রের মত গভীর ও অসীম শক্তিশালী, চিন্তামণির মতো অভিলাষ পূর্ণকারী, আনন্দদায়ক ও সদা জ্যোতির্ময়, হরিচন্দ্রনের মত দুর্লভ, অতুল সৌরভযুক্ত ও সকলের প্রশংসনীয়, গিরিশৃঙ্গের মত সমুন্নত ও দুরারোহ"।[৪] কিন্তু নাগসেনের মতে, এই সমস্ত রূপকের দ্বারা অপূর্ণ ব্যক্তির কাছে নির্বাণের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যুক্তি ও রূপকের দ্বারা রঙ কি তা সঠিকভাবে বোঝানো যায় না। আসলে নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়; সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বর্ণনা করা যায় না।[৫]

চতুর্থ আর্যসত্য: দুঃখ নিরোধ মার্গ। বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণ লাভের সহায়ক আত্মসংযমের পথ বা মার্গ আটটি। যাদের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়। এই অষ্ট পথগুলি সংক্ষেপে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা দেয়। এই পথগুলি সকলের জন্য উন্মুক্ত, সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই আটটি মার্গ বা পথগুলি নিম্নরূপ:

১. **সম্যক্ দৃষ্টি**: আর্যসত্যচতুষ্টয়ের যথার্থজ্ঞানই সম্যকদৃষ্টি। সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা মিথ্যা দৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং জাগতিক বস্তুর প্রতি আমাদের ভোগ-লালসা দূরীভূত হয়। ফলে আমরা নির্বাণের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

২. **সম্যক সংকল্প**: সত্যজ্ঞানের আলোকে ভোগবাসনা জয় করে কর্মসাধনের দৃঢ় মনোবাসনাই সম্যক্ সংকল্প। আসক্তি, হিংসা, দ্বেষ বর্জন করে সর্বজীবে প্রেম ও করুণা বিতরণের দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক্ সংকল্প।

৩. **সম্যক্ বাক্**: বাক্ সংযমই সম্যক্ বাক্। শুধু মিথ্যা কথা না বলাই বাক্ সংযম নয়। আসার বাক্- চপলতা, মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, কটুবাক্য ব্যবহার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকাও বাক্ সংযমের অন্তর্গত।

৪. **সম্যক কর্মান্ত**: সম্যক্ আচরণ হচ্ছে সম্যক্ কর্মান্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মসাধন করতে হবে। পঞ্চশীল ও দানকে বুদ্ধদেব সম্যক্ কর্মান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

৫. **সম্যক্ আজীব**: ব্যবহারিক জীবনযাপন যে বুদ্ধদেব কখনই অস্বীকার করেননি, সম্যক্ আজীবই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৎভাবে জীবন যাপন হচ্ছে সম্যক্ আজীব। হিংসা বা মিথ্যার আশ্রয় পরিহার করে সৎ

উপায়ে সাধককে জীবিকা অর্জন করতে হবে। প্রাণী শিকার, প্রাণী হত্যা, মদ্য বিক্রয় প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সৎ জীবিকা গ্রহণ করতে হবে।

৬. **সম্যক্ ব্যায়াম**: 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ অনুশীলন। সৎ-চিন্তা ও সৎ-প্রবৃত্তির অনুশীলন হল সম্যক্ ব্যায়াম। নির্বাণ লাভের জন্য মন থেকে যাবতীয় কুচিন্তা দূর করতে হবে এবং মনকে সৎ চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে। এ প্রকার মানসিক সতর্কতাই হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়াম।

৭. **সম্যক্ স্মৃতি**: সকল বস্তুর যথার্থ স্বরূপের স্মরণই হল সম্যক্ স্মৃতি। আর্যসত্যচতুষ্টয়, ভোগ, আয়তন এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথার্থ বোধ সর্বদা স্মরণ রাখায় হল সম্যক্ স্মৃতি। এই প্রকার স্মৃতির ফলে জগৎ ও জীবনের অসারত্ব-বোধ জন্মায়, ভোগসুখে বৈরাগ্য দেখা দেয়, ফলে নির্বাণের পথ সুগম হয়।

৮. **সম্যক্ সমাধি**: বুদ্ধদেব-নির্দেশিত দুঃখ নিরোধমার্গের সর্বশেষ স্তর হল সম্যক্ সমাধি। বৌদ্ধমতে নির্বাণ লাভের জন্য যদিও যথার্থ জ্ঞান এবং সংযত আচরণ প্রয়োজন তথাপি শুধুমাত্র তার দ্বারা নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। নির্বাণের জন্য সমাধি বা ধ্যান প্রয়োজন। উল্লিখিত সাতটি অঙ্গ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হলে সাধকের চিত্ত শান্ত হয় এবং সে সমাধির সার্মথ্য লাভ করে। সমাধির আবার চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে নির্বাণার্থী সত্য সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের মাধ্যমে এক সুখকর ও আনন্দময় অবস্থায় অবস্থান করেন। দ্বিতীয় স্তরে নির্বাণার্থীর চিত্ত বিচার বিতর্ককে অতিক্রম করে আর্যসত্যচতুষ্টয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। সাধক এই স্তরে এক দিব্য আনন্দ অনুভব করে। তৃতীয় স্তরে নির্বাণার্থীর সুখানুভূতি ও আনন্দের প্রতি ঔদাসীন্য দেখা দেয়, যদিও আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। চতুর্থ স্তরে নির্বাণার্থী সম্পূর্ণভাবে আত্মসমাহিত হয়, কোন অনুভূতি আর থাকে না। এ এক তুরীয় অবস্থা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা, নির্বাণের অবস্থা।

বুদ্ধদেব কথিত সম্যক্ সমাধির স্বরূপের মধ্যেই ব্রহ্মবিহার ভাবনা নিহিত আছে। সম্যক্ সমাধির মধ্যে চারটি ভাবের উল্লেখ আছে:

১. মৈত্রী: নিয়ত জীবের কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত থাকাই হল মৈত্রী ভাবনা। মৈত্রী ভাবনায় প্রেম ও ভালবাসাকে আশ্রয় করে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করতে হবে।

২. করুণা: জীবের দুঃখমোচনের নিয়ত বাসনায় হল করুণাভাব। বুদ্ধদেবের মতে বিশ্বমানবের দুঃখ অনুভব করতে হলে, এবং সেই দুঃখমুক্তির পথ নির্ধারণ করে দুঃখনিরাস সম্ভব করতে হলে, কেবল মৈত্রী ও করুণাভাবের মাধ্যমেই সম্ভব। জগৎকে হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদির কলুষমুক্ত করতে হলে প্রেম ও করুণাভাবের প্রয়োজন।

৩. মুদিতা: নিজের স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে পরের সুখে তৃপ্তিলাভ হল মুদিতাভাব। মুদিতাভাবের দ্বারা শত্রুভাবের অবসান ঘটে।

৪. উপেক্ষা: নিজের সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ ইত্যাদিকে সমভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ তাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বিশ্ব মানবের কল্যাণ চিন্তায় হলো উপেক্ষা। উপেক্ষার দ্বারা প্রতিহিংসা বৃত্তির লয় হয়।
বুদ্ধমতে ব্রহ্মবিহার এর ক্ষেত্রে কোন অধিকার ভেদ, জাত-ভেদ নেই, তা সব মানুষের পক্ষে- সংসারবাসী শ্রাবক এবং মঠবাসী সন্ন্যাসীর পক্ষে - সাধ্যায়ত্ত। বুদ্ধমতে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় আছে অনন্ত ও অসীমশক্তি এবং আত্মশক্তিতে তাকে প্রকটিত করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই

সম্ভব। নিজ চেষ্টায় নিজ চিত্তকে কলুষমুক্ত করে এবং মৈত্রী ভাবনার পথ ধরে আমাদের সবার পক্ষেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন বা ব্রহ্মবিহার সম্ভব।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি মার্গকে প্রজ্ঞা-শীল-সমাধিরূপেও বর্ণনা করা হয়। 'প্রজ্ঞা' অর্থে 'জ্ঞান'- সম্যকজ্ঞান। যেহেতু অবিদ্যা এবং তার ফল, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মিথ্যা জ্ঞানই আমাদের সব ধরণের দুঃখের কারণ, তাই সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হল সম্যক বা যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা। 'সমাধি' অর্থে 'ধ্যান'- ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসংযোগ। 'শীল' অর্থে 'আচরণ'- দেহ ও মনের সৎ আচরণ। বুদ্ধদেব পঞ্চশীল কে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

১. প্রাণীহত্যা করবে না, সর্ব জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করবে।
২. তোমাকে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করবে না। লোভবশত পরধন গ্রহণ করবে না।
৩. মিথ্যা কথা বলবে না, কেননা মিথ্যা কথা বলার অর্থ হল অপরকে প্রবঞ্চনা করা।
৪. চিত্তশুদ্ধি রক্ষার্থে মাদকদ্রব্য বা নেশাদ্রব্য গ্রহণ করবে না।
৫. কামেচ্ছাকে দমন করতে হবে, কেননা তাতেই মঙ্গল।

যেসব সংসারী মানুষ আরো উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে চায় তাদের জন্য, বুদ্ধদেব আরো তিনটি শীলের উল্লেখ করেছেন:

৬. আত্মসংযম অভ্যাসের জন্য অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করবে না।
৭. উত্তেজক আনন্দ, যথা, নাচ গান ইত্যাদি থেকে এবং বিলাসিতা থেকে বিরত থাকবে।
৮. দুর্জনের সেবা না করে সজ্জনের সেবা করবে এবং পূজ্য ব্যক্তিদের পূজা করবে।

এই অষ্টশীল, বুদ্ধমতে, সংসারী মানুষ মাত্রই পালনীয়। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য বুদ্ধদেব অতিরিক্ত আরও দুটি কঠোর শীলের উল্লেখ করেছেন:

৯. আরামপ্রদ নরম শয্যা পরিহার করে কঠিন কাষ্ঠাসনে শয়ন করতে হবে।
১০. সাংসারিক ভোগবিলাস বর্জন করে দিন-দরিদ্রের সঙ্গে নিরাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে।

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত উপরিউক্ত দশশীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি নির্বিশেষে সব মানুষের নিত্য ও অবশ্য পালনীয় যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত; পরবর্তী তিনটি শীল তিথি বিশেষে উচ্চমার্গীর পালনীয়, আর মঠবাসী সন্ন্যাসীর কাছে দশটি শীলই অবশ্য পালনীয়।

বৌদ্ধ দর্শনে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার শীলের মধ্যে অন্যতম একটি অঙ্গ হল প্রাণী হত্যা না করা। যার অপর নাম অহিংসা। অহিংসা যে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের পালনীয় তাই নয়; অহিংসা গৃহস্থেরও পালনীয়। হিংসা শব্দটিকে বৌদ্ধ দর্শনে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণী হত্যাই শুধুমাত্র হিংসা নয়, প্রাণীর অনিষ্ট কামনা করাকেও হিংসা বলে গণ্য করা হয়েছে। বুদ্ধমতে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে হিংসা করে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত অহিংসক। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে, বিশ্ববাসীর কল্যাণ চিন্তা করা, সকলের প্রতি প্রীতিবোধ প্রণোদিত আচরণ করাই অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য।

উপসংহারঃ দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নীতিদর্শন মানুষ ও সমাজকে চরিত্রবান করে তুলতে পারে। এই নীতিদর্শন যেমন একদিকে মানবিক ও জনকল্যাণের আদর্শ হয়

সেরকম অপরদিকে একটি ন্যায়সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে একটি নৈতিক সমাজ গড়ে উঠবে। বৌদ্ধদৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী নিয়েই আমাদের সমাজ অর্থাৎ সমাজ শুধু মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠে না। সমাজ গড়ে ওঠে পশু-পাখি এবং সমস্ত প্রাণী জগতকে নিয়ে। তাই কোন প্রাণীকে আঘাত করার পূর্বে চিন্তা করা উচিত। আমাদের অনিয়ন্ত্রিত লোভের জন্য এই পৃথিবীতে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে চলেছে। আমরা বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হওয়ার আগে, বৌদ্ধদের দেওয়া মার্গ অনুসরণ করা উচিত।

অতএব আমরা আজও বৌদ্ধ নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করতে পারি। মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সকলে বুদ্ধ শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাজেই একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বৌদ্ধপথ অনুসরণ করা। তাই ব্যবহারিক জীবন তথা দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১. ‘গৌতমবুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা’, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধম্মপদ, ২য় সংস্করণ, হরফ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.২৯।
২. ‘বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব’, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, উদ্বোধন (১০০), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৯।
৩. ‘ভারতের ধর্ম সাধনা ও ’গৌতমবুদ্ধ’ শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়, ধম্মপদ, পৃ. ৭৭।
৪. ‘বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব’, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, উদ্বোধন (১০০), সঙ্কলক ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৯ - ১৭০।
৫. An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, 1954, p. 129.

গ্রন্থপঞ্জী:

1) চট্টোপাধ্যায়, শীতাংশু, ‘ভারতের ধর্ম সাধনা’ ও ‘গৌতমবুদ্ধ’, ধম্মপদ।
2) Chatterjee, S.C., D. M. Dutta, An Introduction to Indian Philosophy, দিল্লী, রূপা পাবলিকেশন, ১৯৫৪।
3) তর্কভূষণ, প্রমথনাথ, ‘বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব’, কলকাতা, উদ্বোধন, ১৯৯৯।
4) Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2014.
5) Venkateshwaran, C. S., The Ethics of the Puranas, The Cultural Heritage of India, Vol. II, 1969.